তৃণকুসুম

দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ সংস্করণ

সাহিত্য পত্রিকা, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

সম্পাদক : শ্রীমতী সুরঞ্জনা সরকার, শ্রী কুশল দে

প্রধান উপদেষ্টা : শ্রী ইন্দ্রনীল কর (অধ্যক্ষ , সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)

উপদেষ্টা মন্ডলী :শ্রীমতী বৈশালী পন্ডিত, শ্রীমতী সোনালী রায়,
শ্রীমতী দীপশ্রী রায় চৌধুরী, শ্রী অমিত সাহা,
শ্রী জয়ন্ত শিকদার, শ্রী কৌশিক ঘোষ

সহযোগিতায় : উপাসনা ব্যানার্জি , রঞ্জন সাউ, রাকেশ মন্ডল
(দ্বিতীয় সেমেস্টার্) ,
তৌশাবা জেসীম (তৃতীয় বর্ষ)
শ্রী তুষার গিরি, শ্রী নবীন মান্ডী, শ্রী অশোক ঘোষ,
শ্রী বিশ্বনাথ বর্ধন, শ্রী গোলাম কুদ্দুস মল্লিক

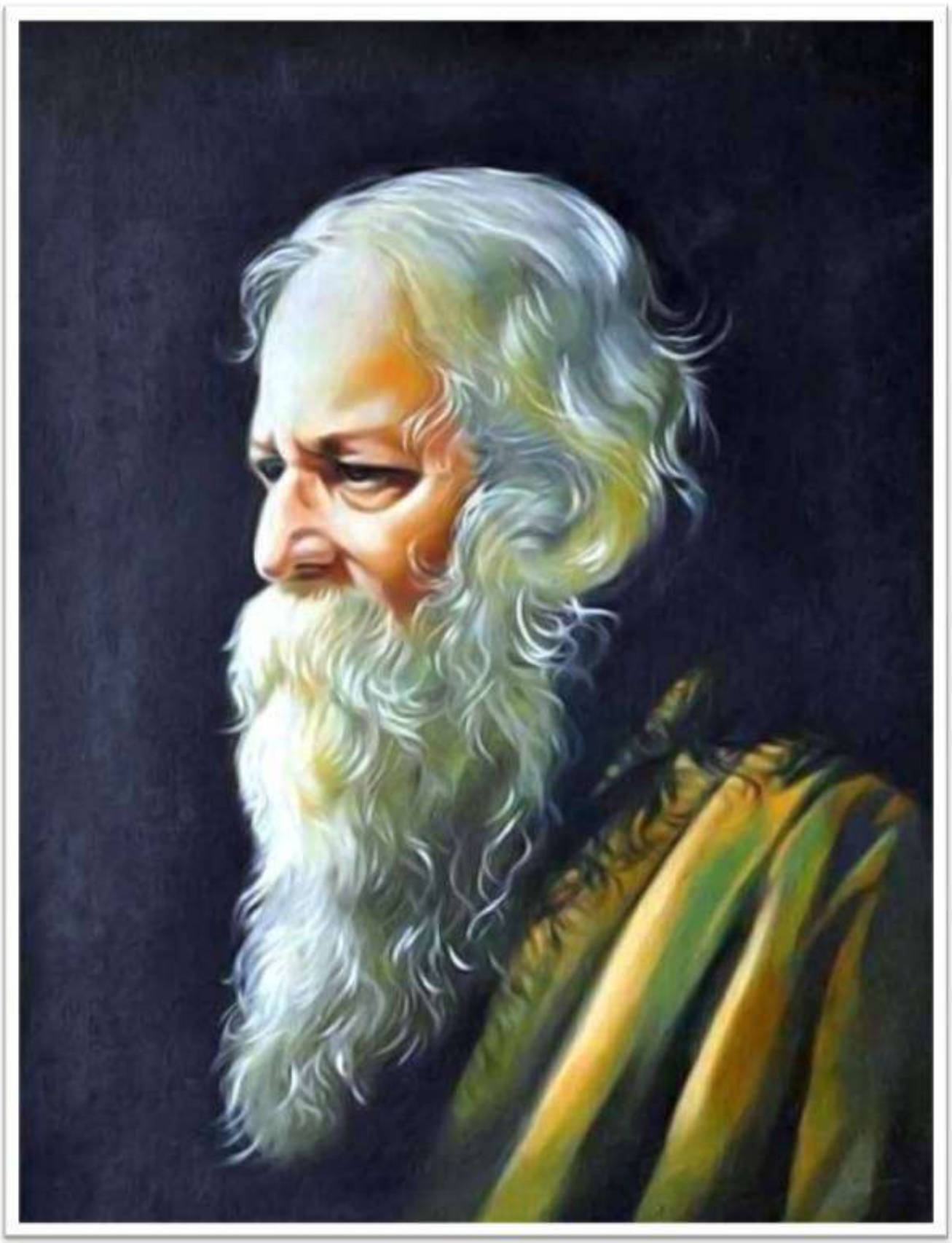

Arun Jana , 2nd Semester

শিক্ষাদর্শনে রবীন্দ্রনাথ

কালের যাত্রায় আমরা এগিয়েছি বহুদূর। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেছি কিন্তু এখনও সঠিক পদ্ধতি বেছে নিতে পারিনি। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে জড়িত যারা, তাদের একাংশই বড় অপকর্ম, ঘুষ, দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার আঙ্গিকটা আরো কলুষিত করছে। একজন কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে কখনোই সেই দুর্নীতির গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে না কারণ আমাদের সমাজের শ্রেনিবিন্যাস সেটা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। অনেকাংশে তারা তাদের সন্তান সন্তানাদিদের এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষিত করতে পারেন না। উপরন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মূলভিত্তি হচ্ছে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা। ব্রিটিশরা এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েছিল কারণ তার মূলে ছিল যে তাদের ছোট কিছু কাজ করিয়ে নেওয়ার মতো কিছু বৃত্তিজীবি তৈরি করা। ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত কিছু 'নেটিভ' তৈরি করা যারা ব্রিটিশস্বার্থ দেখবে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের মাধ্যমে যথার্থ মানুষ হওয়া তো দূরঅস্ত মানুষজন হয়ে উঠতো ঔপনিবেশিকতা কে উপস্থাপন করবার যন্ত্র যা একেবারে ছিল' ব্রিটিশ চালনাধীন। সে শিক্ষা জীবনঘনিষ্ঠ ছিল না। উপমহাদেশের মানুষের ভাবনায় সে শিক্ষা কখনোই প্রাসঙ্গিকতা পায়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রবীন্দ্রনাথ কে বাল্যকাল থেকেই আকর্ষণ করতে পারেনি। সকাল থেকে বিকাল অবধি স্কুলের বাঁধা নিয়ম তাঁর কাছে একঘেয়ে লেগেছিল। কারণ সেখানে ছিল চিন্তার বৈকল্য। তাঁর ভাষায় 'স্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি যে একটা শিক্ষা দেওয়ার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটায় ঘন্টা বেজে কারখানা খোলে, কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাস্টারের মুখও চলিতে থাকে। চারটেয় কারখানা বন্ধ হয় মাস্টারের মুখও বন্ধ হয়। ছাত্ররা দু'চারপাতা কলছাটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে, তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যায় যাচাই হইয়া তাহার ওপর মার্কা পড়িয়া যায়।'

বাংলা একাদেমীর বক্তৃতায় অম্লান দত্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন আলোচনায় বলেন যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনটি সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে গেছেন। মানুষের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সাথে প্রতিবেশীর সম্পর্ক, মানুষের সাথে বিশ্বমানবের সম্পর্ক - এরকম কতগুলি সম্পর্কের ধারণা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলে আছে। প্রকৃতির সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্ক আমাদের কে এই বিশ্বলোকের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত করে এবং আমাদের কে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে গড়ে ওঠা কুসংস্কার কে দূরে রাখতে সাহায্য করে। প্রতিবেশীর ভিতর ব্যক্তির নিজের আত্মাকে প্রসারিত করে। আক্ষরিক ও দাশর্নিক অর্থে আত্মীয়তার এটাই অর্থ। যদিও আত্মীয়তার গ্রাম্য রক্ত হল রক্তের সম্পর্ক। আর দাশর্নিক অর্থ যারা ভিতর দিয়ে আমার ও আত্মার সম্পর্ক প্রসারিত হয়। আর শেষপর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য থাকে সংকীর্ণতাকে দূরে সরিয়ে বিশ্বনাগরিক হওয়ার, যেখানে মূলভিত্তি হল বিশ্ব মানবতা।

তিনি "শিক্ষার হেরফের" নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন মাত্র ৩১ বছর বয়সে। সেখানে তিনি বলেছেন "বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সাথে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সাথে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীনবের মধ্যে একটা

যথাযত সামঞ্জস্য হইতে পারে - আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযত পরিমাণ ধরতে পারি।" তিনি তাঁর প্রবন্ধে আরো বলেন যে "চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য দুইটি অতি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দুটি পদার্থ জীবন থেকে বাদ চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে কাজের সময় তাকে হাতের কাছে পাওয়া যাবে না এ কথা অতি পুরাতন।

রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর সময়ে দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলেছিলো তাতে হতে পারতো না চিন্তা ও কল্পনাশক্তি'র বিকাশ। তাই তিনি বিশ্বভারতীর মতো একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা হতে পারে মুক্তচিন্তার অধিকারী। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য স্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে শিক্ষা কেবলই তথ্য প্রদান নয় বরং তথ্য নিয়ে ভাবতে শেখানো, যুক্তি দ্বারা ঘটনাবলী র সম্বন্ধ নির্নয় করা। তিনি ইংরাজি ভাষার পরির্বতে বাংলা ভাষায় পঠনপাঠনের দাবী রেখেছিলেন কারণ এরফলে সহজেই তাদের চেতনার অংশ হয়ে উঠবে ফলে তার প্রয়োগ অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর এ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি বর্নাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথায় আস্থা রেখে তাঁর পূর্বপ্রতিষ্ঠিত 'ব্রক্ষচর্যাশ্রম' এ নিম্নবর্নের হিন্দু ও মুসলমানদের পড়াশোনার অগ্রাধিকার দিতে চাননি। কিন্তু বিশ্বভারতী ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত যেটা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের পূর্বের ভাবধারা এর সাথে একেবারে মিল পাওয়া যায় না। বিশ্বভারতীর সাথে সাথে তিনি 'শ্রীনিকেতন' নামক একটি প্রতিষ্ঠান যুক্ত করেন। এর লক্ষ্য হয় যে কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমের পল্লীর উন্নয়ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আশি বছরের জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তাই তাঁর শিক্ষাচিন্তা একদিকে ভাববাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত, অপরদিকে প্রয়োগের সময় প্রকৃতিবাদী আদর্শে গড়া। তিনি তাঁর লেখায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষা-বিবর্জিত মানুষদের জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। নবশিক্ষার্থীদের সমাজের প্রয়োজনে এগিয়ে আসার কথা বলেছেন।'বলাকা' কাব্যে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়– মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। এ ঘোষণার বহু আগেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন একই কথা। তিনি তাঁর কাব্যে বলেছেন, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির/ জ্ঞান যেথা মুক্ত সেথা গৃহের প্রাচীর'। এখানে মুক্ত জ্ঞানের আদর্শে মানুষকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, একটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মানবিক, বৌদ্ধিক ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটাতে তাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক শিক্ষাভাবনার আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন দৈনিকের কিছু আর্টিকেল

কুশল দে, তৃতীয় বর্ষ

তুমি রবে নীরবে

প্রথম সংখ্যার আশাতীত সাড়া পর আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহেই দ্বিতীয় সংখ্যার দ্রুত আত্মপ্রকাশ ঘটাতে একপ্রকার বাধ্যই হলাম। তোমাদের এই উৎসাহের প্রতি রইলো আমার আকুণ্ঠ সাধুবাদ। বৈশাখ সংখ্যায় কিছু লিখতে গিয়ে দেখলাম ভ্যাপসা গরম, কালবৈশাখী, বেল, জুঁই আর রবীন্দ্রনাথই মন জুড়ে রয়েছেন। তিনি রয়েছেন এক সুবিশাল মহীরুহের মতো। আজ একটি মেয়ের গল্প বলি। যা খুশি তার নাম দিয়ে নাও।

শৈশবে নিজের মায়ের মাধ্যমে কবে যে রবীন্দ্রনাথের সাথে মেয়েটির পরিচয় ও ক্রমে আত্মীয়তা হয়েছিল তা আজ আর ঠিক মনে পরে না তার। জীবনস্মৃতি ছিল তার প্রথম পড়া কোন আত্মজীবনী আর রবি-কবির গান ক্রমশঃ হয়ে উঠেছিল জীবনপথের পাথেয়। সে যত বয়সে বড় হয়েছে সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাকে বারবার চমকে দিয়েছেন।

জন্মসূত্রে সে ছিল উত্তর কলকাতার একটি নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের সন্তান, যে প্রতিদিন দেখতো নিজের মা'কে তাঁর কাছের মানুষদের মনজগতে জমে থাকা অনেক ক্লেদ, অনেক দ্বেষ গুনতে। সর্পিল ছিল সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনগুলোর গতিপ্রবণতা, যেখানে জমে থাকতো আদিম হিংস্রতার অন্ধকার। এরই মধ্যে তার মা রান্নাঘরে গুনগুন করতেন "এই করেছো ভালো নিঠুর হে" অথবা "আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো"। মেয়েটি বুঝতে শিখলো যে, কবি এভাবেই অগুনতি মানুষের হৃদয়ে রয়েছেন জেগে।

এই মেয়েটির স্কুলে একটা প্রচলিত রীতি ছিল যে মাধ্যমিকের পর একাদশ শ্রেণীতে উঠলে একজন ছাত্রীকে 'শ্রেষ্ঠ বালিকার' পুরস্কার দেওয়া হত। যেটা দিতেন বড়দি নিজস্ব তহবিল থেকে আর পুরস্কার প্রাপক নিজের পছন্দের বইএর নাম লিখে দিয়ে আসতে পারতো। মেয়েটি প্রায় পাঁচ বছর ধরে ঐ দিনটার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল কারণ আর্থিক দুরবস্থার জন্যে আনন্দ পাবলিশার্সের দামী বই-এর মালকিন হওয়া তার কাছে স্বপ্নের মতো ছিল তখন। তাই সে বড়দি কে গিয়ে লিখে দিয়ে এসেছিল - ১) পাহাড়ে ফেলুদা ২) কলকাতায় ফেলুদা

বড়দি ঁডঃ দীপালি বসু চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে দেখলেন তাঁর অতি স্নেহধন্য ছাত্রীটিকে। কিছু বললেন না। নির্দিষ্ট দিনে পুরস্কার হিসেবে তাকে দেওয়া হয়েছিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মানব জমিন', সমরেশ বসুর 'কোথায় পাবো তারে' আর রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও গোরা'। সেদিন ঐ বইগুলো দেখে খুব মনখারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সটান বড়দি কে গিয়ে সে তাই বলেছিল," ম্যাডাম প্যাকিং এর সময়ে হয়তো কোনো ভুল হয়েছে, আমার তো অন্য বই পাওয়ার কথা ছিল"। বড়দি হেসে বললেন ঠিক-ই বই পেয়েছো। 'গোরা' পড়ে দু-সপ্তাহ বাদে আমার সাথে দেখা করবে।

মেয়েটি 'গোরা' পড়ল। ওনাকে তারপর গিয়ে বলল, "খুব বাজে লেগেছে"। বড়দি বললেন"এবার একমাস সময় দিলাম বারবার করে পড়, তারপরে বলবে।" একমাসে সে সত্যিই অনেকবার পড়ে ফেললো। সে এক অন্য অনুভূতি; তখন তার মন জুড়ে রয়েছে ‘গোরা’ আর দিদির জন্য অজস্র কৃতাজ্ঞতা। এবার সে 'গোরা' কে চিনেছে। দিদি তখন বললেন এবার রবীন্দ্রনাথের ‘যোগাযোগ’ পড়ে এসো। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ মেয়েটির শৈশবের অভিবাবক হয়ে উঠেছিলেন। মনের অনেক বন্ধ দরজা খুলে দিলেন। ‘সহিষ্ণুতা’ শেখালেন। আর এদের বিচ্ছেদ হয়নি। “আরো প্রেমে, আরো প্রেমে, মোর আমি ডুবে যাক নেমে”- এ-ছিল মেয়েটির আমিত্বের সাথে তাঁর স্থায়ী পরিচয়।

এরপর প্রায় আট বছর পার করে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগারে কাজ করতে করতে হতাশাভরে একা ল্যাব-এ খোলা গলায় ক্রোঠে গেয়ে উঠেছিলো ‘সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে’ (যারা কোনো বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করেছেন তাঁরা মানবেন যে এমন চিন্তা আসা গবেষণা জীবনে আসা খুবই স্বাভাবিক।) সে হঠাৎ দেখে তার ল্যাব -এর গ্রুপ-ডি কর্মচারী শম্ভু'দা পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। উনি বললেন থামলে চলবে? পরের লাইনগুলো কে গাইবে?

'জানে না রে অধো-ঊর্ধ্বে বাহির-অন্তরে

ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।'

মেয়েটি আবার চমকে উঠলো সেই তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত মানুষটির চেতনায়। অনুভব করল যে এভাবেই রবীন্দ্রনাথ নীরবে শক্তি দিয়ে চলেছেন মনোবিদ হিসাবে শত শত মানুষকে। এই মেয়েটি দেখেছে প্রায় দু-হাজার গ্রামবাসীর সামনে তারগানের মাস্টারমশাই কে গাইতে 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে'। তারপর আর মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথ শুধু উচ্চ শিক্ষিতের বৈঠকী বিষয়।

তাই ২৫ শে বৈশাখ আমার কাছে জীবনে সমস্ত কল্যানের উদ্‌যাপনের এক শ্রেষ্ঠ আনন্দময় বিষয়। ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনুরোধ রবীন্দ্রনাথকে যত পারো জীবনে গ্রহন কর।দেখবে তোমাদের ও একদিন আমার মতো বলতে মন চাইবে-

'তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।'

এতক্ষণে তোমরা অনেকেই চিনেগেছ নিশ্চয়ই যে আমি কোন মেয়েটির কথা বললাম। নামে কি আসে যায়, সেটা না হয় উহ্যই থাক।

ডঃ সুরঞ্জনা সরকার

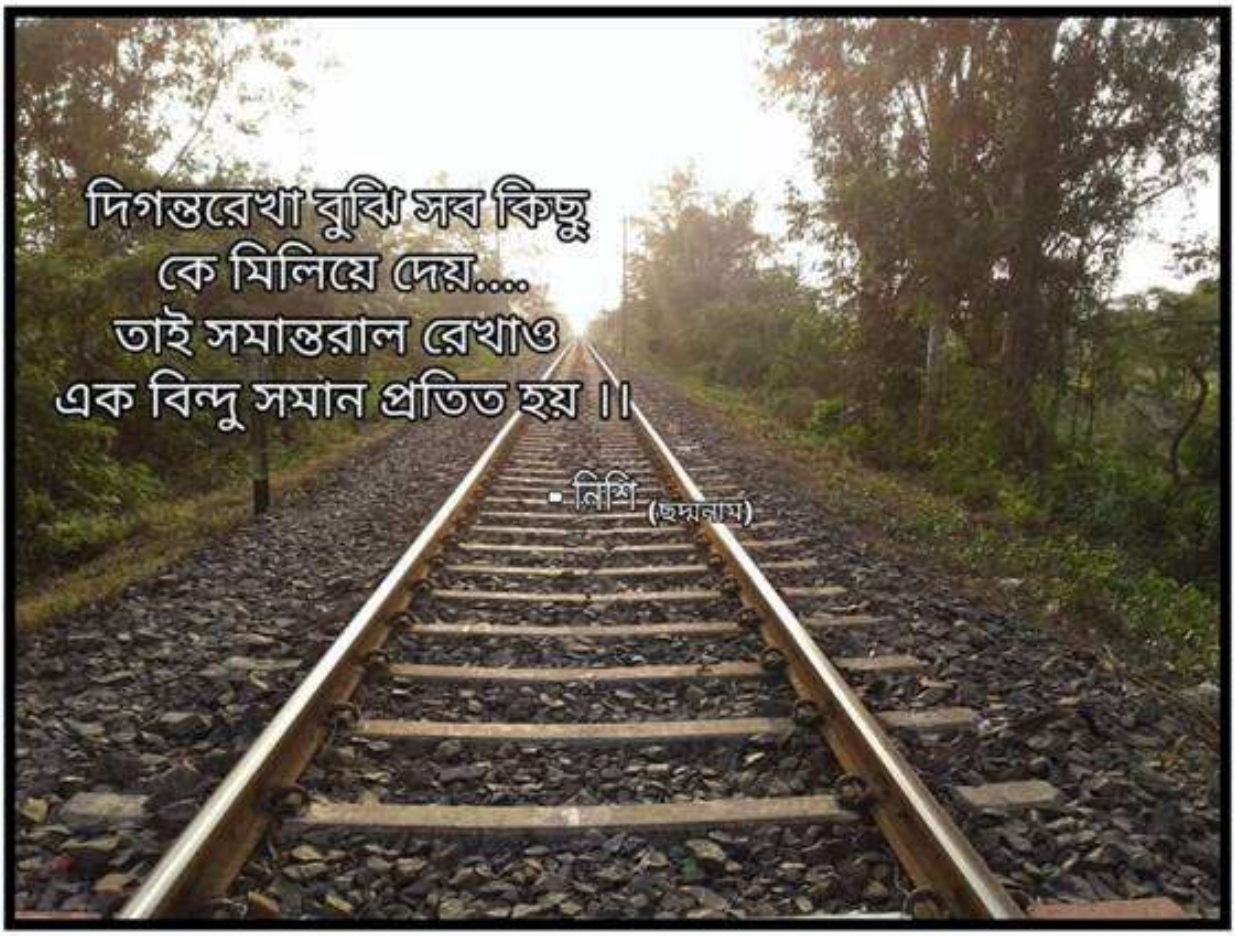

Toushaba Jasim , B.Sc (Batch '15)

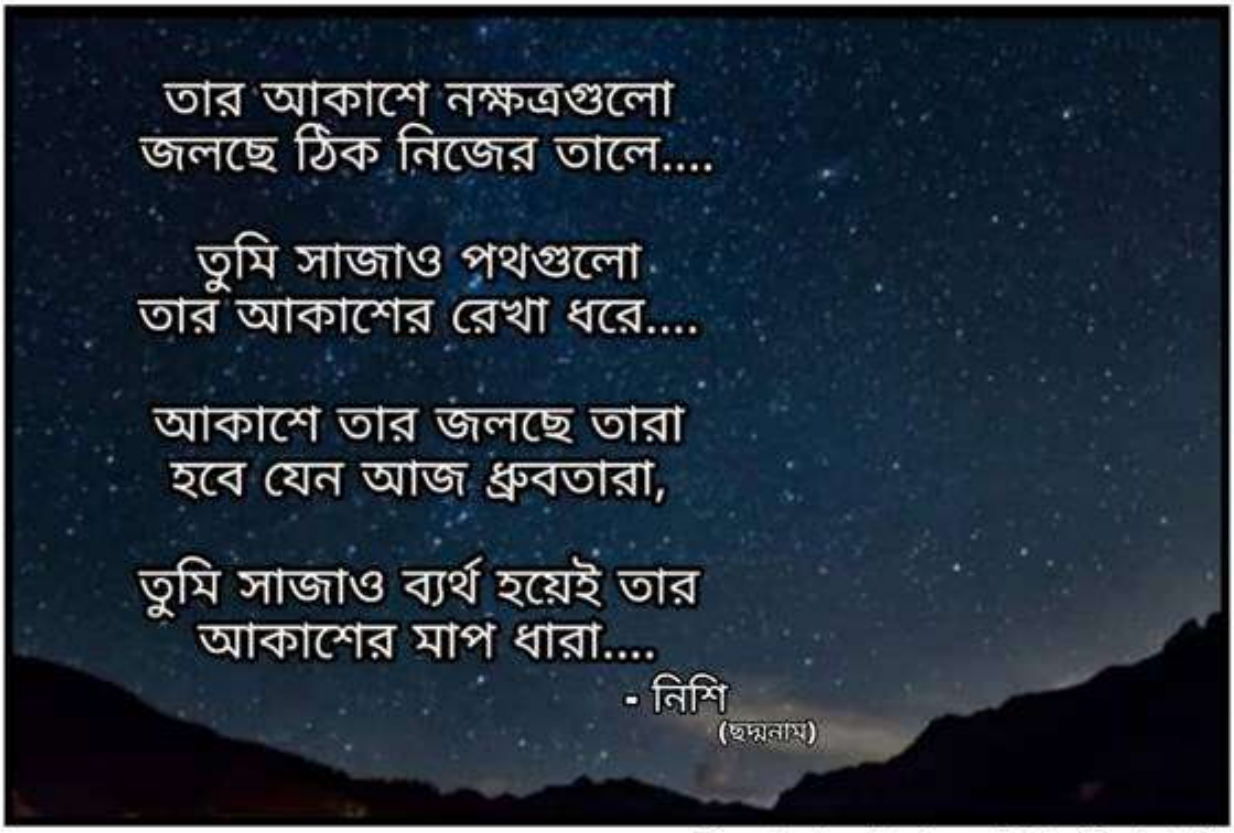

Toushaba Jasim , B.Sc (Batch '15)

ঠিক একদিন হারিয়ে যাব

আজ তোমাদের কিছু কথা শেয়ার করি
যেগুলো আমার মনকে মেরে ফেলেছে।
যেটা আমি পারিনি কাউকে বোঝাতে
যেগুলো পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণা আমাকে জ্বালিয়েছে।
পাইনি আমি আমার কোনো ইচ্ছার মূল্য
শুধু পেরেছি স্বপ্ন দেখে যেতে।।
পারিনি তাকে বাস্তবয়ান করতে
শুধু দেখেছি তাকে শেষ হয়ে যেতে।।
সত্যি! কেউ বোঝেনি আমাকে
কেউ বোঝেনি কি চাই আমি।।
কোনটাতে আমি খুশি হব আর...
কোনটা আমার জীবনে দামী।।
আমি তো চেয়েছিলাম খোলা আকাশ
দেখতে চেয়েছিলাম মাঠ, সবুজ ঘাস।।
চেয়েছিলাম বাঁকা খালের ধার
দাঁড়িয়ে দেখব মাছ, রাঁজহাস।।
কিন্তু কোথায় কিছুই তো পারিনি
ছোট থেকে বন্দী হলাম হোস্টেলে।।
কেউই বোঝেনি আমার কষ্ট
বোঝেনি আমি কী চেয়েছিলাম আসলে।।
আমি চেয়েছিলাম লুকোচুরি খেলতে
খেজুর আর তালগাছের পিছনে।।
হাটতে চেয়েছিলাম সরু মাটির রাস্তা দিয়ে
একা একা হেঁটেই যাব নির্জনে।।
আমি তো চেয়েছিলাম হারিয়ে যেতে

কোন এক অজানা পথে।।

সেখানে কেবল একা এবং একা,

কেউ থাকবে না আমার সাথে।।

আমি অনুভব করতে চেয়েছিলাম

খোলা মাঠের মৃদু হাওয়া।।

দেখতে চেয়েছিলাম সন্ধ্যের সূয্যিডোবা

আর পাখিদের কিচিমিচি করে বাসায় যাওয়া।।

তোমরা আমাকে বুঝবে কিনা জানিনা

জানিনা কারও চিন্তাধারা আমার মত কী না।।

কেউ কী আছে যে আমাকে বুঝবে?

জানিনা আমি সত্যি জানিনা।।

তবে একদিন আমি ঠিক হারিয়ে যাব

ঐ বিশাল নীল আকাশে।।

হারিয়ে যাব খোলা মাঠে, সবুজ ঘাসে,

মিশে যাব খালের ধারের মৃদু বাতাসে।।

মেরিনা সুলতানা, দ্বিতীয় সেমিস্টার

স্বপ্ন পূরণ

অল্প আলোয় গল্প অনেক
স্বপ্ন পাহাড় কমছে পূরণ
বিশ্বাস তার বিভোর ভাঙায়
স্বপ্নে তাও বিভোর হয়ে -
চাইছে দূরের লক্ষ্য ছুঁতে
বৃদ্ধ মনের যুদ্ধ দিনে
থাকবে পাশে কে!
স্বপ্ন আজও ছুটছে বেগে-
কিন্তু স্বপ্ন পূরণ কই
লড়াই করে যাচ্ছি তবু
পাচ্ছি তাকে কই!
নতুন দিনে নতুন ভোরে
নতুন স্বপ্ন দেখতে চাই
হয়তো সেটাও পূরণ হবেনা
তাও স্বপ্ন পূরণ করতে চাই।।

রাকেশ মন্ডল, দ্বিতীয় সেমিস্টার

বৈশাখের সেই দুপুর

দিনটা ঠিক মনে পড়ছে না। বেশ অনেকগুলো দিন কেটে গেল তারপর থেকে।বৈশাখের এক নির্জন দুপুরবেলা।মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য্য, ঠিক যেন একটা আগুনের গোলা।যার লেলিহান শিখায় আকাশ, মাটি গাছপালাসহ সমগ্র বিশ্ব পুড়ছে।সবুজের কোনো চিহ্নই নেই চারিদিকে। ফুটিফাটা মাটির মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছে যেন প্রতপ্ত ধরনীর দীর্ঘশ্বাস। বড় বড় গাছগুলোও প্রাণ বিনাশের আশঙ্কায় শঙ্কিত, নিশ্চল, স্তব্ধ। বৃষ্টির কোনো চিহ্নই নেই, আকাশ দেখে মনে হয় বৃষ্টির সম্ভবনাও নেই। তৃষিত আকাশ প্রখর রবির তাপে কাঁপছে আর বৃষ্ঠির জন্য প্রহর গুনছে। চাতক পাখীরাও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বারিধারার প্রতিক্ষাররত। এরখমই এক নির্জন দুপুরে আর পাঁচজন মানুষের মত আমিও ঘরে বন্দী। একটি আধখোলা জানলার পাশে আধাশোয়া, চোখ বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যপটে নিবদ্ধ। শষ্য ধূ-ধূ মাঠ। কোনো গৃহপালিত পশুর ও কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। মেঠো পথও ফাঁকা। কোনো জনমানব নেই। আঁকা-বাঁকা সরু পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে বহুদূর চলে গেছে।

হঠাৎ মনটা যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে কল্পনার জগৎ এ চলে গেল। পাখি ডানা মেলে উড়ে যায়, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসে রাজকুমার - রাজকুমারী, এইরকম এক কল্পনার জগৎ এ। রূপকথার জগৎ এ হঠাৎ যেন হারিয়ে গেলাম। মনের মধ্যে অতীতের কত সুখ-দুঃখের কথা ভীড় করছিল, কত ঘটনাই মনের ওপর ছায়া ফেলেছিল বুঝতেই পারিনি। কত অজানা আনন্দে মন রোমান্টিক হয়ে গিয়েছিল, আবার কত অজানা দুঃখে মন ব্যথিত হয়ে গেল।

মাঠের প্রান্তে রয়েছে এক শীর্নকায় নদী। শুধুই নুড়ী, পাথর - কাদায় ভর্ত্তি, জলের কোনো চিহ্ন নেই সেখানে। মাঝে মাঝে কানে আসছে ঘুঘুর ক্লান্ত ডাক। একসময় চোখে পড়ল অনেকদূর থেকে খড়কুটো, ধুলোবালি নিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে এক ঘূর্ণিবাতাস মাঠ পেরিয়ে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তাপের প্রবাহে ভাটা পড়েছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। মানুষ, গোরু, ছাগলগুলোকেও পথে দেখা যায়। পাখিরাও বিকেলের আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঘন কালো মেঘ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়া সূর্যকে ঢেকে ফেলে, শুরু হয়ে যায় মেঘের দুন্দুভি। এভাবেই আমার দুপুরের দৃশ্যপট হারিয়ে যায়। জীবনের স্মতির ফলকে থাকা বিভিন্ন হিজিবিজি রেখার মধ্যে যে - চারটে মোটা রেখা রয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হল আমার এই দুপুরের একাকীত্ব ; এরকমই ছিল বৈশাখের সেই দুপুর।

উপাসনা ব্যানার্জি , দ্বিতীয় সেমিস্টার

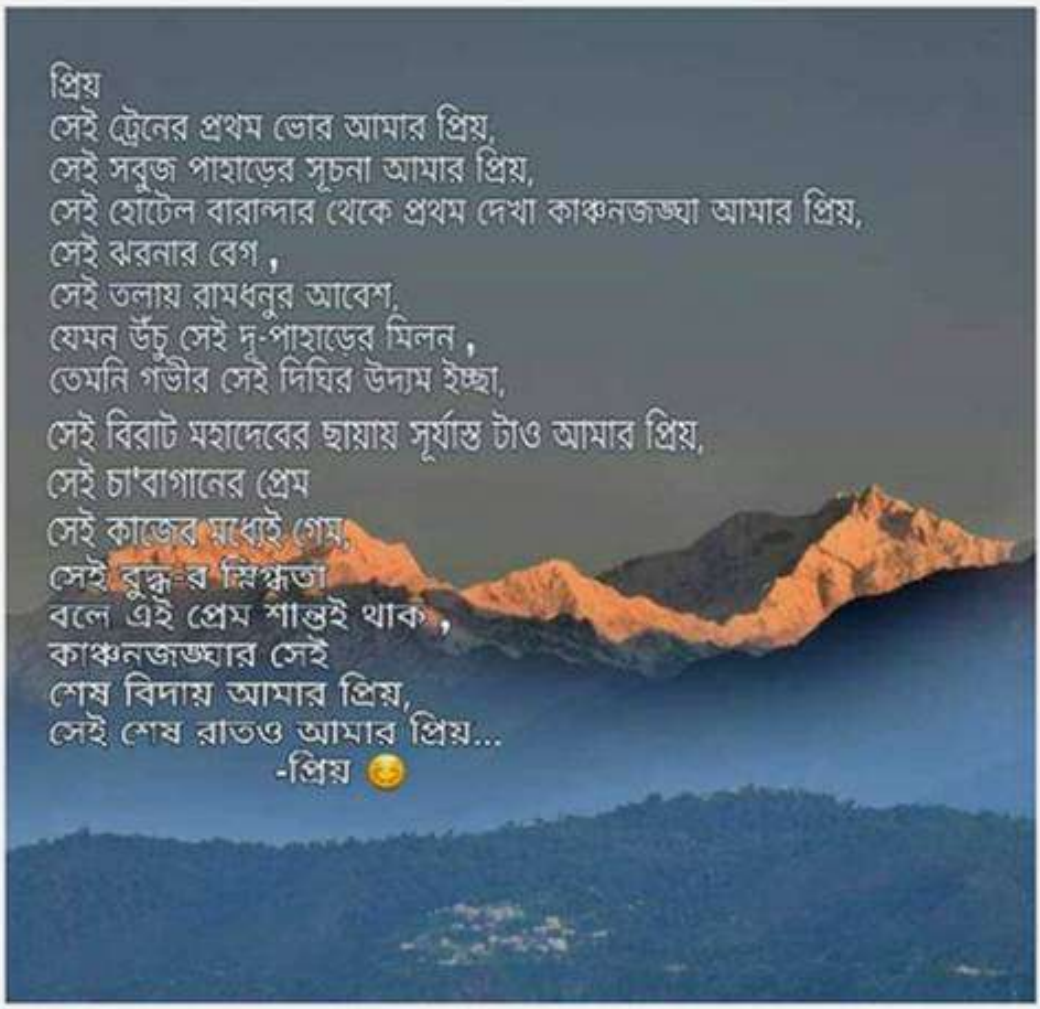

Jamaima Jasim , B.Sc (Batch '15)

Uzma Jasim, B.Sc. (Batch '15)

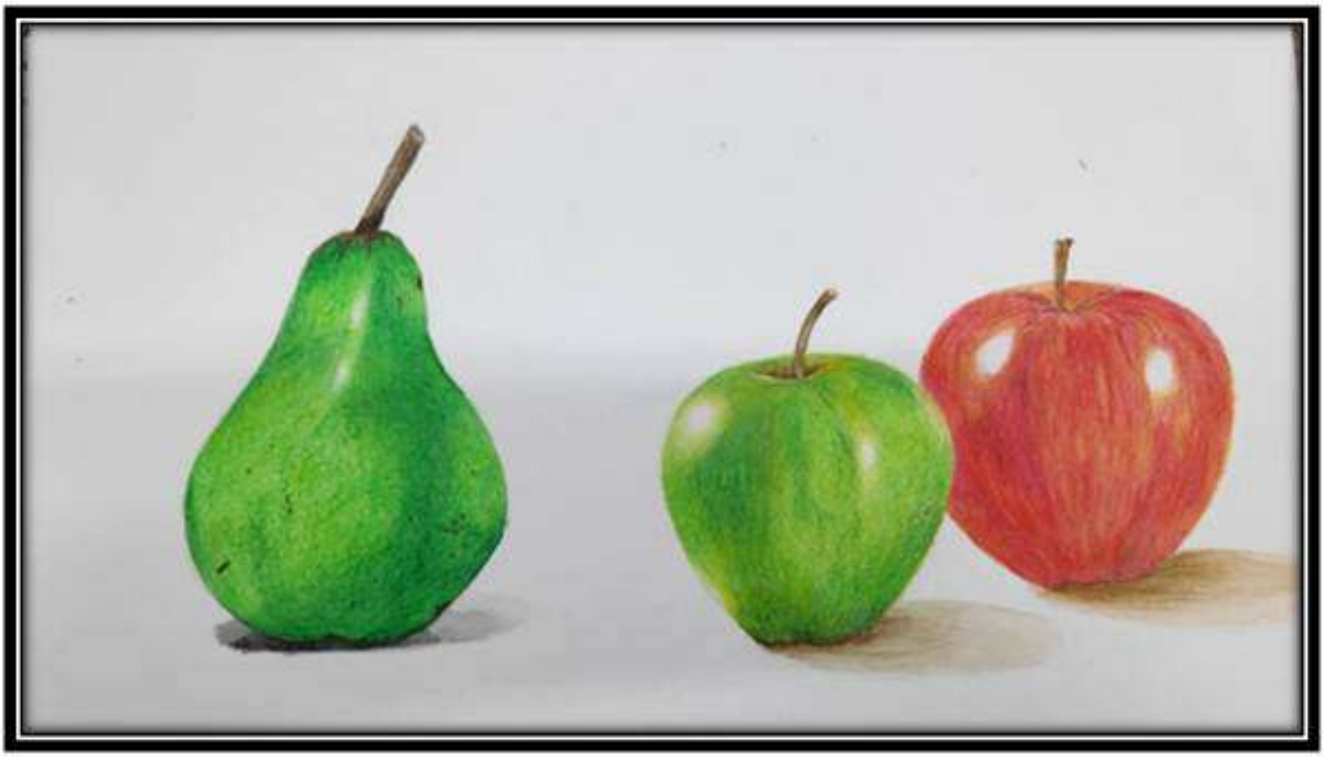

Dipashree Roy Chawdhury

Aranya Mandal,
2nd year

Sonali Roy

Ranjan Shaw, 2nd Semester

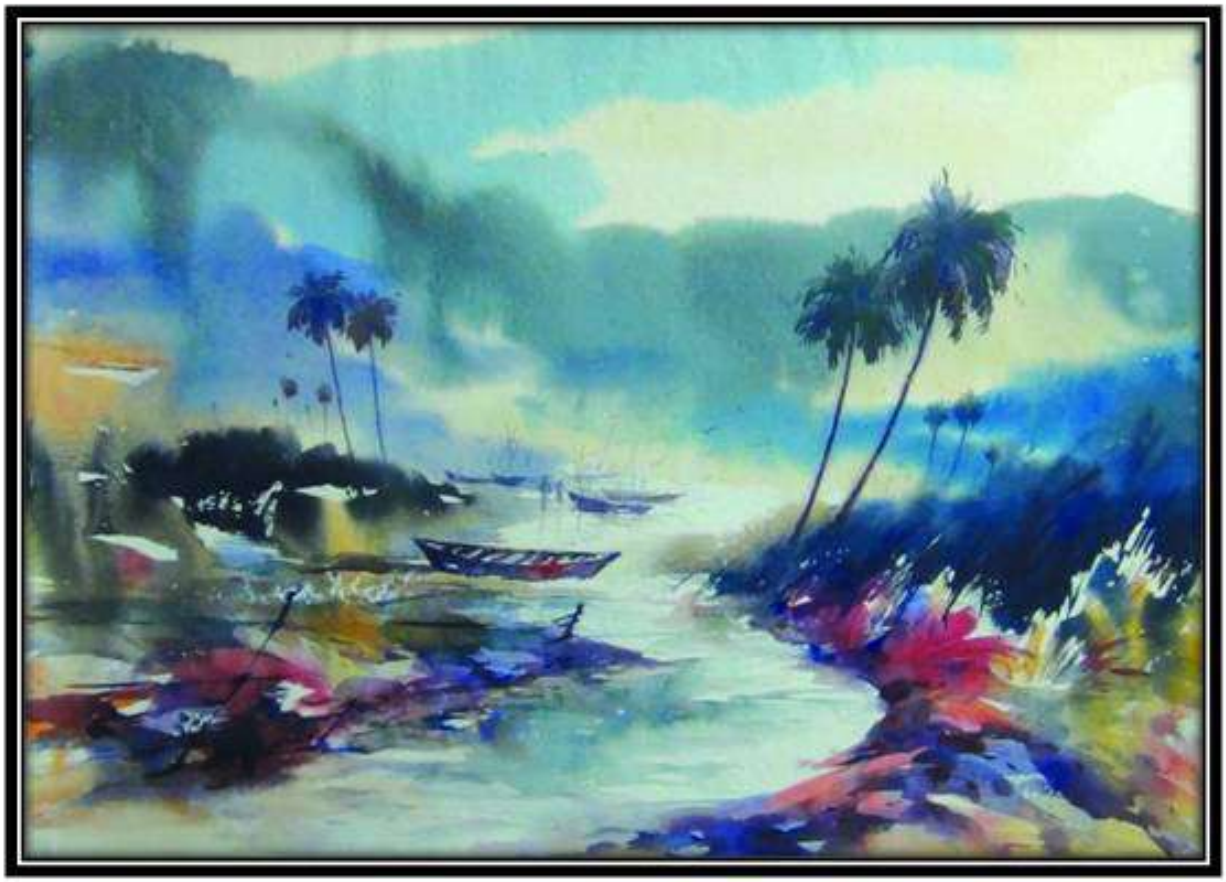

Arun Jana , 2nd Semester

Baishali Pandit